মানসিক রোগ

ও

অন্ধবিশ্বাস

AUTHOR

ডাঃ অলোক পাত্র

(Neuro Psychiatrist)

স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

M.B.B.S. (Cal.) D.P.M (NIMHANS, Bangalore)
D.N.B. (New Delhi), F.I.P.S., M.I.M.A., F.I.A.P.P.

- Psychiatrist– in– Charge :
  Pranabananda Seva Sadan,
  Psychiatric Nursing Home.
- Ex-Resident :
  National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore.
  Central Institute of Psychiatry, Ranchi
- Ex-House Physician :
  Calcutta National Medical College & Hospital.
  Calcutta Pavlov Hospital (Gobra)
- Ex-Visiting Consultant.
  Antara, Baruipur

১। ভর হওয়া - একটি মানসিক রোগ ঃ-

অনেক ব্যক্তিকে ঠাকুর দেবতা ভর করেন । এই সব রোগী নিজের পরিচয় ভুলে গিয়ে ঐ ঠাকুর বা দেবতা বলে নিজেকে পরিচয় দেন এবং 'এটা কর, ওটা কর ' বলে নির্দেশ দেন । এটি একটি মানসিক রোগ। সাধারণতঃ রোগী কোন মানসিক চাপ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকলে এরকম হয়। এই ভাবে রোগী নিজের চাপ অবচেতনভাবে মুক্ত করেন এবং তার অবচেতন ইচ্ছা দেবতার ইচ্ছা রূপে প্রকাশ করেন - যাতে বাড়ির লোক শীঘ্রই তা পূরন করেন।তবে সব 'ভর' হওয়াকে রোগ বলে গণ্য করা হয় না। যদি ব্যক্তি নিজে বলেন যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এটা হয় এবং তা থেকে মুক্তি চান; অথবা তার বাড়ীর লোকজন এটা বন্ধ করতে চান তবেই এটাকে রোগ হিসাবে গন্য করা হয়।

২। একাধিক জনের একই সাথে মুর্চ্ছা যাওয়া -গণ হিস্টিরিয়া ঃ-

- স্কুলে বা গ্রামে অনেক সময় দেখা যায় পর পর বেশ কয়েক জন হঠাৎ হঠাৎ মুর্চ্ছা যাচ্ছে। লোকে এটাকে অপদেবতার ভর বা ঐ ধরনের কিছু ভাবেন। পূজা, যাগযজ্ঞ করেন - ব্যাধি তাড়ানোর জন্য। এটি আসলে হিস্ট্রিরিয়ার এপিডেমিক। সাধারণত দুর্বল চিত্তের মেয়েরা কোনো একজন রোগীকে রোল মডেল (Role Model) করে অবচেতন ভাবে তারই রোগ নকল করতে থাকেন- ফলে একের পর এক- অনেকে একই ধরনের রোগে পড়েন।

৩। যৌনাঙ্গ কুঁকড়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আতঙ্ক ঃ-

যৌনাঙ্গ কুঁকড়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার আতঙ্ক - একটি মানসিক রোগ । ছেলেদের মনে হয় যে তার লিঙ্গ ও শুক্রাশয় ছোট হয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং এভাবেই পেটের মধ্যে ঢুকে গেলেই সে মারা যাবে। মেয়েদের মনে হয় ব্রেস্ট ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে । এগুলো অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়. একই গ্রামে অনেকের একের পর এক একসাথে ঘটছে । অনেকে এটাকে ভৌতিক বা অলৌকিক কোনো ঘটনা হিসাবে প্রচার করে । আসলে কিন্তু এটা একটা মানসিক রোগ - অনেকটা হিস্টিরিয়ার মত , যার নাম কোরো (Koro)। চিকিৎসা করলে সেরে যায়।

৪। হাত কাঁপা, উদ্বেগ, অনিদ্রা, যৌন অনীহা -(মদ নিরামক নয়— রোগ বর্ধক ঃ-

হাত কাঁপা কমাতে ; টেনশন, উদ্বেগ, মানসিক বা পারিবারিক চাপ কমাতে; ঘুমের জন্য ; যৌন ইচ্ছা বা ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অনেক মদ খাওয়া শুরু করেন । তাতে সাময়িক উপশম হলেও কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান হয় না। তাছাড়া দীর্ঘদিন মদ খেলেও এই সব উপসর্গ দেখা যায়। অনেকে একবার নেশা শুরু করে মদে আসক্ত হওয়ার পর হঠাৎ বন্ধ করলে এই সব লক্ষণ বেশী দেখা দেয় এবং তা এড়ানোর জন্য মদ খাওয়া চালিয়ে যান। ধীরে ধীরে মদে ডিপেন্ডেন্ট (dependent) হয়ে পড়েন। ফল স্বরূপ পরবর্তীকালে প্রাথমিক উপসর্গ , মদের নেশা , মদের কমপ্লিকেশান (complication-) সব একসাথে মিলে জটিল রূপ ধারন করে।

৫। রূপ, চেহারা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত খুঁতখুঁতানি -একটি মানসিক রোগঃ

রূপ বা চেহারা নিয়ে অনেকেই খুব খুঁত খুঁতে হন। দেখতে সুন্দর নয় বলে অবসাদে ভোগেন , কেউ আবার নাক বাঁকা বা ঠোঁট মোটা (যা বাস্তবে নয়)- সর্বদা এরকম ভাবনার জাবর কাটেন। এটি একটি মানসিক রোগ। একে বলে ডিসমরফোফোবিয়া (Dysmorphophobia)।

৬। যৌনাঙ্গ সরু বা ছোট ভেবে দুশ্চিন্তা- একটি মানসিক রোগ ঃ-

শরীরের গঠন অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমানুপাতে হলেও লিঙ্গের সাইজ বা ব্রেস্টের সাইজ সমানুপাতে হয় না। তবে ব্রেস্ট বা লিঙ্গের সাইজের সাথে যৌনজীবনের বা যৌন তৃপ্তির কোনো সম্পর্ক নাই । কারন যৌন তৃপ্তি একটি মানসিক বিষয়। অনেক ক্ষেত্রের রোগীর পার্টনারের এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলেও রোগী নিজে সর্বদা ঐ বিষয় নিয়ে গুমরে থাকেন। বিয়ের আগে কিছু ছেলেমেয়েদের এই উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। এটিও একটি মানসিক রোগ - যা চিকিৎসায় সহজে সারে।

৭। স্বামীর স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ - একটি মানসিক রোগ ঃ -

অনেক স্বামী-- স্ত্রীকে বা স্ত্রী-স্বামীকে সর্বদা সন্দেহ করেন যে অন্য কারোর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। কোনো প্রমান বা কারণ ছাড়াই সন্দেহ হয়। সর্বদা পাহারায় রাখেন-- কারো সাথে চোখাচোখী হলে, কথা বললেও অশান্তি করেন। অনেক সময় নিজের মা - বোন-- বাবা-- দাদার সাথেও সন্দেহ করেন। একে বলে ডিলুসন্যাল ডিসঅর্ডার (Delusional Disorder) । চিকিৎসা করলে সেরে যায়। কিন্তু যারা এটাকে রোগ বলে চিনতে পারেন না- তারা পাল্টা শাসন ও মারধর করে অশান্তি বাড়ান। কেউ কেউ সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বা বশে রাখার জন্য গুনীনের কাছে যান-- যাতে সমস্যা আরও জটিল হয় ।

৮। বিদেশী প্রোটীন,বিশেষ পোষাক, এনার্জি রিচার্জার ও মনো চিকিৎসাঃ-

উদ্ভট এবং অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতি অতীতেও ছিলো - বর্তমানেও আছে । নতুন আগমন ঘটেছে বিদেশী প্রোটিন, বিশেষ পোষাক, এনার্জী রিচার্জার । সমস্যা হোলো কিছু রোগী এগুলি ব্যবহার করে উপকার পান আর তাই এসবকে অযৌক্তিক বলা কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে ডাক্তারী শাস্ত্রে প্ল্যাসিবো (Placebo) বলে একটি বিষয় আছে। কোনো ওষুধ ছাড়াও যদি শুধু ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল খোলা যদি রোগীকে দেওয়া যায় - তবে দেখা যায় এক তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে রোগীর উন্নতি হচ্ছে । উন্নতির কারণটা মানসিক । কারণ রোগীর মনে ভরসা, বিশ্বাস কাজ করে যে তার চিকিৎসা চলছে - তিনি ভালো হওয়ার আশা করে, পজিটিভ চিন্তা করে আর তার থেকেই উন্নতি হয় - একে বলে প্ল্যাসিবো এফেক্ট (Placebo effect)। তাই তারা এসবের দিকে বেশি ঝোঁকেন। বিপদ হচ্ছে যে প্ল্যাসিবো এফেক্ট (Placebo effect) সাময়িক হয়। পরে রোগ আগের জায়গায় ফেরে ।এই সময়ে রোগ বেড়ে আরো জটীল হয়। মা রাত্মক অসুখের ক্ষেত্রে এই সময় অপচয় বড় বিপদ ডেকে আনে।

৯। অমাবস্যা - পূর্নিমা কোটাল ও মনোরোগ ঃ-

অমাবস্যা , পূর্নিমায় মানসিক রোগের লক্ষন বৃদ্ধিপায়-- সেই কারণে অনেকে মানসিক রোগকে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব বা গ্রহের ফে র বলে ভাবেন এবং সেটা কাটাবার জন্য বালা , আংটি , তাবিজ পরেন; যাগযজ্ঞ করেন কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় না-- উল্টে ব্যয়ের ধাক্কায় রোগ বেড়ে যায় । মানসিক রোগের লক্ষন অমাবস্যায় , পূর্নিমায় বাড়ে --সেটা পরীক্ষিত বাস্তব হলেও কিন্তু কোটালের প্রভাব মানসিক রোগের কারণ নয়। অতীতে লুনার মানথ্ -- luner month) বা চন্দ্রমাসের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ভেবেই মানসিক রোগীকে লুনেটিক (lunatic) বলা হোতো। পরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এই ধারণা ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন হয়। বর্তমানে তাই আর মানসিক ভারস্যামহীনদের লুনেটিক (lunatic)বলা হয় না।

১০। মাসিক ও মনোরোগের প্রকোপ ঃ-

অনেক মানসিক রোগের তীব্রতা মাসিকের সময় বাড়ে। সে কারণেই অনেকে ভাবেন যে মানসিক রোগটা আসলে মাসিকেরই গন্ডগোল । এটা ভুল ধারণা। মাসিকের সময় অন্যান্য অনেক অসুখের মতো মানসিক রোগেরও তীব্রতা বাড়ে-- কিন্তু সেটা ওই রোগের কারণ নয়।

১১। মাসিক ও মনোরোগের ঔষধ ঃ-

মাসিকের সময় অনেকে মনোরোগের ঔষধ বন্ধ করে দেন। শুধু মনোরোগের নয় , সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসারই ঔষধ বন্ধ করে দেন অনেকে । এই সময় নাকি ঔষধ খাওয়া চলে না । এটি একটি অবৈজ্ঞানিক ধারনা । দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ঔষধ কখনই হঠাৎ করে বন্ধ করা উচিৎ নয়-- তাতে বড় রকমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । মাসিকের সময় মেয়েদের শরীর বাকী সারা মাসের মতো একই রকমই থাকে-- সামান্য কিছু নিয়মিত পরিবর্তন ছাড়া। কাজেই ঔষধ বন্ধ করার কোন যুক্তি নেই ।

১২। প্রসবের পর মানসিক সমস্যা ঃ-

বাচ্চা প্রসবের পর অধিকাংশ মায়েদেরই কিছু না কিছু মানসিক সমস্যা ঘটে । যেমন কেউ কেউ খুব অবসাদে ভোগেন যাকে বলা হয় পোষ্ট পার্টাম ব্লু (Post Pertum blue) । কারোর কারোর বিষন্নতা এতো বাড়ে যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়, ক্ষিদে ঘুম কমে যায়, বাচ্চার বা নিজের কোন যত্ন নিতে পারে না- একে বলা হয় পোষ্ট পার্টাম ডিপ্রেসান (Post Pertum Depression) । আবার কেউ কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করেন যেমন বাচ্চাকে নিজের বলে অস্বীকার করেন , মেরে দিতে চান , দুধ খাওয়ান না , কোলে নিতে চান না , অথবা ভাবেন অন্যেরা বাচ্চাকে মেরে দেবে- তাই কাছ ছাড়া করেন না; অকারনে হাঁসা, কাঁদা , ক্ষিদে ঘুম না হওয়া ইত্যাদি হয়। একে বলে. পোষ্ট পার্টাম সাইকোসিস (Post Pertum Psychosis) । এই ধরনের সমস্যা কে অনেকে ভাবেন 'গা শুকোয় নি' বা 'হাওয়া বাতাস লেগেছে' , 'মেয়ে হওয়ায় অখুশি', 'শ্বশুর বাড়ির লোক অত্যাচার করেছে' ইত্যাদি । এসবই ভ্রান্ত । এ সবই মানসিক রোগ যা চিকিৎসায় সারে।

১৩। ঋতুচক্র (Menstruation Cycle) ও মনোরোগ ঃ-

মহিলাদের ঋ তুচক্রের বি ভিন্ন সময়ে মানসিক অবস্থার বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয় - যা স্বাভাবিকের থেকে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে রোগ হিসাবে গণ্য হয় । যেমন অনেকের মাসিকের দিন সাতেক আগে থেকে বিরক্তি, খিট খিটে মেজাজ, গুম মেরে থাকা, মাথা বা শরীরের যন্ত্রনা হওয়া, খিদে ঘুম কম হওয়া , মনোসংযোগ কমে যাওয়া, অলসতা, অল্পে ক্লান্তি , টেনশন , নার্ভাসনেস , উদ্বেগ ইত্যাদি হয় । এটাকে বলে প্রিমেনস্ট্রুয়্যাল ডিস্ফোরিক ডিসঅর্ডার (Premenstrual Dysphoric Disorder - PMDD) । যেহেতু অসুবিধেগুলি মাসিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই অনেকে এগুলিকে মাসিকের সমস্যা বলেই ভাবেন । কিন্তু এগুলি একপ্রকার মানসিক রোগ এবং এসব সমস্যায় মনো চিকিৎসায় সহজেই নিরাময় হয়।

১৪। ঋতু পরিবর্তন ও মানসিক রোগ ঃ-

কিছু মানসিক রোগ আছে যা বৎসরের একটা বিশেষ ঋতুতেই হয় যেমন- গ্রীষ্ম , শীত বা বর্ষা; অথবা ঋতু পরিবর্তনের সময় হয় -যেমন গরমের পর বর্ষা এলে, শীতের পর গরম পড়লে। রোগের লক্ষণ- গুলি সাধারণত ডিপ্রেসান (কিছু ভালো না লাগা , খিদে- ঘুম কমে যাওয়া , অলসতা , ক্লান্তি, বিরক্তি ইত্যাদি) বা ম্যানিয়া (অতিরিক্ত আনন্দ বা রাগ ,বেশী কথা বলা, বড় বড় কথা বলা, বেশী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা , অস্থিরতা, মারামারী ভাঙ্গ চুর করা ইত্যাদি হয়)। এটাকে বলে সিজোন্যাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (Seasonal Affective Disorder)।এটি বাইপোলার অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (Bipolar Affective Disorder) - সেখানে চক্রাকারে ডিপ্রেসান ও ম্যানিয়া হয় - এরই একটা বিশেষ রূপ। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রোগটা হওয়ার কারণে অনেকে এটাকে মানসিক রোগ বলে চিনতে পারেনা । ভাবেন রোগীর ধাতে ঠান্ডা , গরম বা বৃষ্টি সহ্য হয় না । কেউ কেউ শরীর বেশী ঠাণ্ডা করেন বা সর্দি গর্মির চিকিৎসা করান । ফলে মূল রোগ চিকিৎসাহীন ভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

১৫। অ্যাসিড, গ্যাস ও মনোরোগ ঃ-

— অজ্ঞতার কারনে আমাদের দেশের অনেকেই অধিকাংশ শারীরিক এবং মানসিক রোগের কারণ হিসাবে অ্যাসিড আর গ্যাসকেই দায়ী করেন। শরীরের যে কোনো ব্যথা যন্ত্রনা , অনিদ্রা , ক্ষুধামন্দা , অবসাদ , মৃগী, মাইগ্রেন, মাথার যন্ত্রনা , এমনকি অস্বাভাবিক আচার আচরণকে অ্যাসিড গ্যাসের কারনে হয় বলে ভাবেন । ঝুড়ি ঝুড়ি ওষুধ খান গ্যাস অ্যাসিডের। এতে রোগের নিরাময় হয় না--- বরং রোগ আরও ক্রনিক ও জটিল (Complicated) হয় । উনবিংশ শতাব্দীতে মানসিক ভারসাম্যহীনদের চিকিৎসার জন্য পেটের কোলন (Colon) অপারেশন করে বাদ দেওয়া হত। তখন মানসিক রোগের কারন না জানার কারনে কোলনের টক্সিক পদার্থ কেই কারণ হিসাবে ভাবা হত । দুই শতক পরেও জনসাধারনের , এমনকি কিছু চিকিৎসকের ঘাড় থেকে সেই গ্যাসের ভুত নামেনি।

১৬। ব্যথা , বেদনা ও মনোরোগ ঃ-

শরীরের কোনো অংশের ব্যথা বা বেদনার কারণ যদি পরীক্ষা নিরীক্ষায় না পাওয়া যায় এবং ২ বৎসরের বেশি সময় ধরে থাকে তবে তাকে ক্রনিক পেন সিনড্রোম (Chronic Pain Syndrome) বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিপ্রেসান (Depression) এর কারনে এটা হয় । এছাড়া যে কোনো আর্থাইটিস বা নিউরোপ্যাথির ব্যথা দীর্ঘদিনের হলে তা ডিপ্রেসান (Depression) ডেকে আনে; বা ডিপ্রেসান থাকলে যে কোন ব্যথা বেদনা বেশী কষ্ঠ মনে দায়ক হয়। সেক্ষেত্রে মূল রোগের চিকিৎসার সাথে ডিপ্রেসানেরও চিকিৎসা করাতে হয়।

১৭। ব্যথার ঔষধে নেশা ঃ-

অনেকে মাথার যন্ত্রনা , দীর্ঘদিনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ব্যথার ঔষধ খাওয়া শুরু করেন । কেউ কেউ দিনে ৪ টা থেকে ১০ অবধিও অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট (Analgesic tablet) খান । ওই সব ব্যক্তি নিজের অজান্তেই এ্যানালজেসিক ড্রাগ (Analgesic drug) এ আসক্ত হয়ে পড়েন । বন্ধ করলেই উইথড্রয়াল এফেক্ট (Withdrawal effect) এ ব্যথা ও যন্ত্রনা বেশী অনুভব হয় , ফলে ছাড়তে পারেন না । এ্যানালজেসিক ড্রাগ (Analgesic drug) বেশী খেলে গ্যাসট্রাইটিস , আলসার ও কিডনীর প্রবলেম হয় । কখনো কখনো তা মৃত্যুরও কারন হয়। ব্যথার ঔষধের নেশা - চিকিৎসায় সারানো যায় ।

১৮। নেশা দীর্ঘদিনের হলেও ছাড়ানো যায় ঃ -

অনেকে মনে করেন মদ , মাদকের নেশা দীর্ঘদিনের হলে তাকে ছাড়া বা ছাড়ানো সম্ভব নয়। কেউ কেউ ভাবেন দীর্ঘ দিনের নেশা ছাড়লে শরীরের আরও বেশী ক্ষতি হয় - বা রোগী মারাও যেতে পারেন। ফলে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি বা তার বাড়ির লোক আগ্রহ দেখান না নেশা ছাড়ানোর জন্য ।

নেশা যত দীর্ঘদিনেরই হোক তা ছাড়ানো যায় এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ছাড়লে কোন ক্ষতির সম্ভবনা থাকে না।

অনেকে ভাবেন যে নেশা ধাপে ধাপে ছাড়তে হয় - একেবারে ছাড়া ঠিক নয়। বাস্তব সত্যটা ঠিক উল্টো। কমিয়ে কমিয়ে নেশা বন্ধ করা কঠিন। কারন দু-দিন কমালে তৃতীয় দিনে আবার বেড়ে যায়। নেশা ছাড়লে একেবারেই ছাড়তে হয়-- তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

১৯। পাগল হলেই সাজা মকুব হয় না ঃ-

অনেকেই ভাবেন পাগল হলেই সাতখুন মাপ; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। মানসিক রোগীর শাস্তি তখনই মুকুব হয় যদি প্রমানিত হয় যে রোগীর মানসিক অসুস্থতা এমনি পর্যায়ে পৌঁচেছে যেখানে তার বিচারবোধটুকুও নেই - যে সে যা করছে তার পরিনতি কী, বা যা করছে তা ভুল, অথবা আইনবিরুদ্ধ। তবে ফাঁসি, জেল থেকে রেহাই পেলেও রোগী মুক্ত হয় না-- তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয় - সুস্থ না হওয়া পর্যান্ত ।

২০। পাগল হলেই মামলা বন্ধ হয় না ঃ-

বাদী বা বিবাদী মানসিক ভারসাম্য হারালেই মামলা বন্ধ হয় না। মানসিক রোগী যদি ততখানি অসুস্থ হন যখন তিনি মাললার বিষয়বস্তু বুঝতে অক্ষম; উকিলের সাথে আলোচনায় অক্ষম ; বা নিজেকে ডিফেন্ড (defend) করতে অক্ষম হন। তবে বিচার মুলতুবি থাকে। সুস্থ হলে বিচার পুনরায় চালু হয়।

২১। মানসিক রোগীও সম্পত্তি উইল করতে পারেন ঃ-

মানসিক রোগী যদি দলিলের বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম হন এবং সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হন তাহলে তিনি সম্পত্তি উইল করতে পারেন। তাবে রোগীর মানসিক সুস্থতা মনোচিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষিত হতে হবে এবং উইলের সময় দাবীদার ছাড়াও আরও দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে।

২২। ভোট দেওয়া ,ভোটে দাঁড়ানো , সাক্ষ্যদান, ব্যবসায়ীক চুক্তি , উত্তরাধিকার ও মনোরোগ ঃ-

মানসিক ভারসাম্যহীন যখন অসুস্থতার দুটো এপিসোডের মাঝের সময়ে সুস্থ থাকেন সেই সময়টাকে বলা হয় লুসিড ইন্টাভাল (Lucid Interval)। সেই সময় রোগী ভোট দিতে পারেন এবং ভোটে দাঁড়াতে পারেন । ব্যবসায়িক চুক্তি করতে পারেন।আদালতে সাক্ষীও দিতে পারেন । মানসিক ভারসাম্যহীন বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তানসন্ততি সম্পত্তি সমান উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তবে কেউ রোগের কারনে যদি সম্পত্তি রক্ষানাবেক্ষনে অক্ষম হন, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে তার অভিবাবকরা একজন বেতনভূক- ম্যানেজার নিয়োগ করতে পারেন- যাতে অভিভাবকহীন অবস্থাতে তারা এবং তাদের সম্পত্তি আইনগত ভাবে সুরক্ষিত থাকে।

২৩। মানসিক রোগী অনিচ্ছুক হলেও - তার হাসপাতালে ভর্ত্তি বা চিকিৎসা হতে পারেঃ-

অনেকে ক্ষেত্রে রোগী এতই ভয়ঙ্কর ও ক্ষমতাশালী হন যে বাড়ীর লোকের। তাকে ভর্তি বা চিকিৎসা করাতে পারেন না। এক্ষেত্রে রোগীর বাড়ীর লোক, পরিজন বা প্রতিবেশী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের সাহায্য ব্যক্তিকে আটককরে দুজন চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে- যদি মনে করেন যে রোগী সত্যিই অসুস্থ এবং ভর্ত্তির যোগ্য - তাহলে হাসপাতাল কে রিসেপসান অর্ডার (Reception Order) দিতে পারেন। কিছুটা সুস্থ হলে রোগী নিজেই চিকিৎসায় সম্মত হন।

২৪। শুভাকাঙ্খী চাইলে অপরিচিত মানসিক রোগীরও চিকিৎসা করাতে পারেন ঃ-

ভবঘুরে পাগল , বিপদজ্জনক পাগল , বাড়ীতে অবহেলিত মানসিক রোগীকে অপরিচিত কেউ (যিনি অন্তত বিগত দু সপ্তাহ রোগীকে দেখেছেন) চাইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন । তিনি বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিত ভাবে

জানালে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের সাহায্যে এন্‌কোয়ারী (enquiry) করে- ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে- হাসপাতালে ভর্তির অর্ডার দিতে পারেন। পরে রোগী সুস্থ হলে তার আপনজনের খোঁজখবর নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।

২৫। ভবঘুরে পাগলও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে ঃ-

অনেকে ভাবেন যে বদ্ধ পাগল- যারা সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় নোংরা জামা কাপড় পরে ঘোরেন - জঞ্জাল কুড়িয়ে খান - তারা কখনই সুস্থ হতে পারে না। এটা ভুল ধারনা। রোগ পুরানো হলে চিকিৎসায় বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু রোগ সারে। তাছাড়া যারা রাস্তায় ঘোরেন তারা সবাই দীর্ঘদিনের রোগী ভাবা ভুল। মানসিক ভারসাম্যহীনদের একটা গোষ্ঠী শুরুতেই নিজের পরিচয় ঠিকানা ভুলে যান। ফলস্বরূপ অজানা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোন। ঐ সব রোগীদের অল্প কয়েকদিন চিকিৎসা করালেই স্মৃতি শক্তি ফেরে - তাদের কাছ থেকে নাম ঠিকানা জেনে ফেরত পাঠানো যায় অতীত জীবনে। এ ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ালে আশা করা যায় যে আমাদের হারানো স্বজনও একদিন ফিরে আসবে - কখনো রোগে নিরুদ্দেশ হলে।

২৬। মানসিক রোগীর চিকিৎসা- হাসপাতাল নয়, বাড়ীই আদর্শ জায়গা ঃ-

অনেকেই ভাবেন মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী মাত্রই মানসিক হাসপাতালে ভর্ত্তি রাখতে হয় ; কেউ কেউ ভাবেন সারাজীবন রেখে দিতে হয় - অনেকটা জেলের কয়েদিদের মতো। এটা ভ্রান্ত ধারনা। বর্তমানে যা চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তাতে রোগীকে বাড়ীতে রেখেই চিকিৎসা করা যায়। একিউট স্টেজ (Acute stage) এ রোগী বাড়ীতে ম্যানেজ করতে না পারলে; ঔষধ বা খাওয়ার খাওয়াতে না পারলে কিছু দিনের জন্য নার্সিহোম বা হাসপাতলে ভর্তি রাখতে হলেও পরবর্তী চিকিৎসা বাড়ীতে রেখেই করা যায়। বাড়ীর পরিবেশ - রোগ সেরে যাওয়ার পর রোগীকে আগের স্বাভাবিক সমাজ জীবন, কর্মজীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মানসিক হাসপাতালে সুস্থ হওয়ার পরও রোগীকে রেখে দিলে রোগী আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর রেখে

দিলে রোগ জটিল হয় - রোগীর স্বাভাবিক জীবনে ফেরা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পুরানো রোগীতেই হাসপাতাল ভর্তি থাকায় নতুন রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

২৭। মানসিক রোগীর পড়াশুনা বন্ধ করা উচিত নয় ঃ-

মানসিক রোগ হলেই অনেকে রোগীর পড়াশুনা বা ব্রেনের কাজ বন্ধ করে দেন। কিছু কিছু চিকিৎসক ও এরকম পরামর্শ দেন। অথচ এতে রোগীর উপকারের থেকে অপকার বেশী হয়। রোগীর চিকিৎসা ঠিকমতো হলে পড়াশুনা বা ব্রেনের কাজ করায় কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বরং পড়া বা কাজ বন্ধ করলে রোগীর জীবন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে, হতাশা বাড়ে। রোগীর অলস, কর্মহীন থাকায় মানসিক চাপ বাড়ে— রোগ আবার ফিরে আসে।

২৮। মানসিক রোগীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধ -রোগের থেকেও বেশী ক্ষতিকারক ঃ -

মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে গেলেও বাড়ীর লোকেরা তাকে নানান বিধিনিষেধের মধ্যে রেখে দেন। বাইরে বেরোতে দেন না। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশতে, খেলতে, সাঁতার কাটতে দেন না। আত্মীয় পরিজনের কাছে যেতে দেন না, সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যান না। অনেকের পড়া বা কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখেন। এতে রোগী সুস্থ হয়েও - প্রতিবন্ধীর জীবন যাপন করেন। মৃগী রোগীর ক্ষেত্রে এটা আরও প্রকট ভাবে দেখা যায়। ভয়ে আতঙ্কে বাড়ীর লোক রোগীকে চোখের আড়াল করেণ না। দেখা যায় যে রোগীর জীবনে রোগে যত না ক্ষতি হয়— তার থেকে বেশী ক্ষতি হয় পরিবার - সমাজের আরোপীত বিধি নিষেধের ফলে।

২৯। শেকলে বেঁধে মানসিক রোগ নিয়ন্ত্রন - মধ্যযুগীয় বর্বরতা ঃ -

এখনো আমাদের দেশে বহু মানসিক রোগীকে চিকিৎসা না করিয়ে হাত পায়ে বেড়ী শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখে দেওয়া হয় বছরের পর বছর । রোগীরা ঐ অবস্থাতেই মল মুত্র ত্যাগ , স্নান , আহার করে। অথচ বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে কোনে ভায়োলেন্ট (violent) রোগীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শান্ত করা যায়। চিকিৎসা না করে ওই ভাবে ফেলে রাখলে রোগীর রাগ , ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা ছাড়াও কিছু রোগী স্বাভাবিক নিয়মে কয়েক মাস পর সুস্থ হতে পারে - যদি তাকে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়। শেকল বন্দী করে রাখলে রোগী আজীবন রোগীই থেকে যায়। অষ্টাদশ শতকে কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় মানসিক রোগীকে শেকল বন্দী করে মেন্টাল এ্যাসাইলাম (Mental Asylum) এ রেখে দেওয়া হতো । উনবিংশ শতকের গোড়ায় ফ্রান্সের বিখ্যাত চিকিৎসক ফিলিপ পিনেল (Philippe Pinel) শৃঙ্খল মুক্তির (Dechaining) আন্দোলন করে মানবিক চিকিৎসার উপর জোর দেন। আজ ২০০ বছর পরেও , মনোচিকিৎসার এত উন্নতি স্বত্ত্বেও যখন গ্রামে গ্রামে ভারসাম্যহীনরা শেকল বন্দী হয়ে থাকেন, তখন মনে হয় -এ দেশ এখনও মধ্যযুগেই আছে-- শৃঙ্খল মুক্তির ঢেউ দুশো বছরেও পৌঁছয় নি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।